সমকাল
রোববার | ২৬ এপ্রিল ২০২০ | ১৩ বৈশাখ ১৪২৭

করোনাতে গরিবদের জন্য করণীয়

দুর্যোগ মোকাবিলা

ড. খুরশিদ আলম

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট

সব দুর্যোগে খাদ্য এবং চিকিৎসা সাহায্য রাষ্ট্র এবং সমাজের সামর্থ্যবানদের দিতে হয়। তবে এবারের এ দুর্যোগে সামর্থ্যবানদের পক্ষে সাহায্যের হাত বাড়ানোর ক্ষমতা কিছুটা হলেও কম থাকবে

সারাদেশ একপ্রকার লকডাউনের কারণে গরিব লোকেরা প্রায় সবাই কর্ম হারিয়েছেন। আগে থেকে যারা হতদরিদ্র, তাদের অবস্থা আরও খারাপ। সম্প্রতি ব্র্যাকের এক গবেষণায় দেখা যায়, খাদ্যের অভাবে ভুগছে এমন লোকের সংখ্যা ১৪ শতাংশ। বিবিএসের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে হতদরিদ্র লোকের সংখ্যা প্রায় ১১ শতাংশ, আর এই সর্বনাশা করোনার জন্য দরিদ্রদের মধ্যে যারা নিচের দিকে গড়িয়ে পড়েছেন, তাদের সংখ্যা আরও ৪-৫ শতাংশ হবে। সুতরাং ব্র্যাকের গবেষণা ছাড়াও এটি বলা যায় যে, খাদ্যাভাবে ভুগছে এমন লোকের সংখ্যা সর্বনিম্ন ১৫ শতাংশ হবে। আবার এটি ১৪-১৫ শতাংশে স্থির থাকবে এমন কোনো কথা নেই। কারণ যত দিন যাবে ততই অন্যদের জন্যও সংকট বাড়বে। সংকটগ্রস্ত মোট পরিবারের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৫৭ লাখ।

শহরের কথা যাই হোক, গ্রামের দিকে এসব লোকের তালিকা করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এখন প্রতিটি ইউনিয়নে সব খানার তালিকা রয়েছে। এ ছাড়া পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার কাছে ইউনিয়নের সব পরিবারের সদস্যসহ তালিকা আছে। ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ বিভিন্ন কারণে অসহায় পরিবারগুলোর তালিকা বিভিন্ন সময় করা হয়েছে, যা প্রতিটি ইউনিয়নে রয়েছে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা মিলে মাত্র একদিনে একেকটি ওয়ার্ড করে দু'দিনেই একটি ইউনিয়নের তালিকা করা সম্ভব। কারণ এখনও একটা ওয়ার্ডে পরিবারের সংখ্যা মাত্র ৬০০-৭০০।

১৯৯৮ সালে বন্যার সময় সরকার ৬ মাস ধরে ভিজিডির মাধ্যমে হতদরিদ্রদের নিয়মিত চাল ও অন্যান্য রিলিফসামগ্রী সরবরাহ করে দুর্যোগ ব্যবস্থানায় একটি অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। সেই সময় যদিও বিবিসি বলেছিল, দেশের দুই কোটি লোক মারা যাবে কিন্তু দুইশ' লোকও মারা যায়নি। এখন পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন কোনো অফিস-আদালত বন্ধ করতে হয়নি, কোনো চলাচল বন্ধ করতে হয়নি, অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ করতে হয়নি কিংবা দোকানপাট বন্ধ করতে হয়নি। বন্যা বা সাইক্লোনের মতো দুর্যোগ এটি নয়, আর সেই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একইভাবে কাজ করবে না।

সব দুর্যোগে খাদ্য এবং চিকিৎসা সাহায্য রাষ্ট্র এবং সমাজের সামর্থ্যবানদের দিতে হয়। তবে এবারের এ দুর্যোগে সামর্থ্যবানদের পক্ষে সাহায্যের হাত বাড়ানোর ক্ষমতা কিছুটা হলেও কম থাকবে। আবার ১৯৯৮ সালে বিরাট এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এনজিওর প্রদত্ত ঋণের টাকা ছিল, যা তাদের দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা করেছিল। কিন্তু এবার তার চেয়েও বেশি লোকের কাছে বেশি টাকা থাকলেও লকডাউনের কারণে তারা সে টাকার সদ্ব্যবহার করতে পারছে বলে মনে হয় না।

তাই এখন দুটো চ্যালেঞ্জ– একদিকে কমপক্ষে ৫৭ লাখ পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা। তবে আশার কথা হলো, এখন খাদ্য আমদানি না করে প্রথমত যেসব কৃষকের ঘরে বিক্রয়যোগ্য খাদ্য আছে, তাদের কাছ থেকে তা কিনে নিয়ে যাদের দরকার তাদের দেওয়া। বর্তমানে হাওর এলাকার ধান কাটা শুরু হয়েছে এবং আর এক মাস পরে সারাদেশে বোরো ধান কাটা হবে। এ ছাড়া সরকার যদি আউশ ধান উৎপাদনের ওপর জোর দেয়, তাহলে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বা সরবরাহ পাইপলাইন ভালো থাকবে। এ জন্য দরকার প্রতি মাসে শুধু চালের জন্য প্রায় ১৫০০ কোটি এবং আরও সহায়ক লাগবে ২০০০ কোটি টাকা। প্রতি মাসে ৩৫০০ কোটি টাকা এবং ৪ মাসে লাগবে ১৪০০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, সরকারের নিত্যদিনের কাজ পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা খরচ বা রাজস্ব ব্যয় অব্যাহত রাখা, সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখার টাকার জোগান দেওয়া অর্থাৎ রাজস্ব এবং উন্নয়ন ব্যয় দুটো চালাতে হবে।

প্রশ্ন হলো, এ টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে? সরকার এ টাকা তিনটি উৎস থেকে পেতে পারে : (১) সরকার ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিতে পারে, (২) বিদেশি সংস্থা থেকে ঋণ বা সহায়তা নিতে পারে এবং (৩) নতুন নোট ছাপিয়ে তা করতে পারে। মোট কথা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক– দুটো উৎস থেকে চেষ্টা করা দরকার এবং তা বেশ হিসাব করে করা দরকার। বেশি করে দেশে টাকার প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারে।

সরকার এ ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে পারে, তবে সেখান থেকে ইতোমধ্যে অনেক টাকা নেওয়া হয়েছে এবং আরও নিতে হবে। দাতা সংস্থা থেকে সাহায্য নিতে পারে বিশেষ করে এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জাইকা, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি। আর সর্বশেষ হচ্ছে নতুন মুদ্রা ছাপিয়ে সরকারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। নতুন নোট ছাপার চেয়ে বিদেশি সাহায্য অনেক বেশি কার্যকর হবে। কারণ নতুন নোট ছাপাতে গেলে মূল্যস্ফীতি অনেক হবে, যা অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

মোট কথা, দেশের খাদ্য সহায়তার জন্য দেশের মধ্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হলেও উন্নয়নের ব্যয় সব বিদেশ থেকে ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে উন্নয়ন ব্যয় থেকে একটি অংশ আসবে রাজস্ব হিসেবে। দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের জন্য সরকারকে প্রধানত স্বচ্ছতার সঙ্গে খাদ্য কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে সঠিক তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি পরিবার ন্যূনতম খাদ্য সাহায্য পায়।

এনজিওগুলোর মাধ্যমে গ্রাম এবং শহর এলাকায় বেশি করে অর্থনীতিতে টাকা প্রবেশ করানো যেতে পারে। আর এর জন্য পিকেএসএফের মাধ্যমে ২ শতাংশ সুদে বা বিনা সুদে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কর্মসূচির আওতায় ঋণ দেওয়া যায়, যা তারা ৫ শতাংশ সুদে বিতরণ করবে। করোনার কারণে যেসব ব্যক্তি যে ঋণের টাকা শোধ করতে পারেনি, তার সুদের টাকা সরকার ধীরে ধীরে এনজিওগুলোকে পরিশোধ করা, যাতে ওইসব ব্যক্তি দারিদ্র্যের মধ্যে স্থায়ীভাবে না আটকা পড়ে। এ ছাড়া বর্তমান অর্থবছরের অসমাপ্ত কাজগুলো আগামী অর্থবছরের চার মাস পর্যন্ত অব্যাহত রেখে তা সমাপ্ত করার চেষ্টা করা, যাতে জাতীয় আয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারে।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশ আক্রান্ত হওয়ার ফলে সেসব দেশে কম দামি পণ্যের চাহিদা বাড়বে এবং তার সুবিধা সবচেয়ে বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবে চীন। তার সঙ্গে বাংলাদেশকে সে সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে তৈরি থাকতে হবে। প্রত্যেকটি দুর্যোগের একটি সুবিধা থাকে। সে সুবিধা নেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।